দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিশুর শিক্ষাঃ শিক্ষক ও অভিভাবকের দায়িত্ব

মাহমুদা কণা

নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর একটি শিশুকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করার জন্য প্রতিটি পরিবার একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। সেই প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে বিদ্যালয়। ভাল একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিয়ে শিশুকে নতুনের দিগন্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন তার অভিভাবক। শিশুটি পরিবারের পরিচিতজনদের ছেড়ে এই প্রথম অজানা মানুষজনদের মাঝে এসে পৌঁছে। কেউ কেউ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে মানিয়ে নেয় বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে আবার কেউ সহজেই তা পারে না।

শিশুকে স্কুলের প্রতি আগ্রহী আর মনোযোগী করে তোলার দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের উপর থাকে। আর এটা তো অনস্বীকার্য যে, মা-বাবার পর একজন শিশু সর্বপ্রথম ভালবাসে তার শিক্ষককে। সর্বপ্রথম সে অনুকরণ করতে শেখে শিক্ষকের প্রতিটি আচরণকে। মর্যাদার সাথে সে তার শিক্ষকের প্রতিটি আদেশ পালন করতে চেষ্টা করে। শিশুর কোমল মনে শিক্ষকের উপস্থিতি প্রতিদিন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়। শিক্ষকের চোখে আকর্ষণীয় আর অনুগত হওয়ার জন্য সে নিজেকে প্রতিদিন নতুন করে সাজাতে ব্যস্ত থাকে।

প্রতিটি শিশুর কাছে তাই তার শিক্ষক অত্যন্ত ভালবাসার আর সম্মানের। একজন শিক্ষককে শিশুর সবটুকু মনোযোগ আকর্ষণ করার মত শক্তি ও মেধা অবশ্যই থাকতে হয়। থাকতে হয় তাঁর মধুর ও আন্তরিক ব্যবহার। প্রতিটি শিশুর মন জয় করেও পুরোপুরি ভয় কাটে না একজন আদর্শ শিক্ষকের। কারণ শিশুর মন অল্পেই আহত হয়।

কিন্তু একজন শিশু কি একাই তার স্কুলের প্রতি, তার শিক্ষকের প্রতি আগ্রহী হতে পারে? তাকে আন্তরিকভাবে আগ্রহী করে তোলার দায়িত্ব মা-বাবারও। বাড়ীর সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ। স্কুলে সে কি কি করলো, কোন্ শিক্ষক তার খাতায় আজ 'গুড' লিখেছেন, এইসব নিয়ে আলোচনা করলে একজন শিক্ষার্থী উৎসাহী হয়ে ওঠে। তার ভেতর উদ্দীপনা সঞ্চার হয়। স্কুল তার নির্ধারিত ডাইরীতে শিক্ষক কি লিখে দিলেন, কোন্ কোন্ পাঠ পরবর্তীদিনের, তা দেখে নিয়ে তাকে সেভাবে প্রস্তুত করে দেয়ার দায়িত্ব একজন মায়ের। তাই বলা হয়, একজন শিক্ষিত মা একটি শিক্ষিত জাতি তৈরী করতে পারে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা আজ কি দেখছি? অল্প কিছু কিন্ডার গার্টেন স্কুল আর বিশেষ কিছু ভাল স্কুল ছাড়া শিক্ষার পরিবেশ আজ সম্পূর্ণরূপেই বিলুপ্ত। বেশীর ভাগ স্কুলগুলোতে এক-একটা শ্রেণীতে শিক্ষার্থী থাকে সত্তর-আশির কাছাকাছি। ঠাসাঠাসি বসে পর্যাপ্ত বাতাস আর আলোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের প্রতি কি করে মনোযোগী হবে? আবার এর উপর একটি বেঞ্চে ছয়জন শিক্ষার্থী বসে কিভাবেই বা পড়ে কিভাবেই বা তাদের বইপত্র, ব্যাগ ইত্যাদি জিনিস গুছিয়ে রাখে! আর শিক্ষক যদি শ্রেণীতে লিখতে দেন, তাহলে এত কাছাকাছি বসার দরুন একজন অন্যজনেরটা দেখে দেখে লিখে ফেলে। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই এই অবস্থা। যেখানে শ্রেণীর অভাবটা অত্যন্ত প্রকট। শিক্ষার্থীরা যদি আলো বাতাসের মধ্যে খোলামেলা বসতেই না পারলো তো সে কিভাবে তার বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে মনোযোগী হবে? আবার এর মধ্যে যেসব স্কুল টিন শেড-এর তৈরী, বৃষ্টির দিন তো বিদ্যালয়ে আর শিক্ষার তেমন পরিবেশই তৈরী করা যায় না। এক-টিনের শব্দ, দুই-বেঞ্চে পানি পড়া। এইসবও শিক্ষার্থীর মন বিরূপ করে তোলে শিক্ষার প্রতি।

তবুও এতসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও শিক্ষার্থীরা পড়া তৈরী করে। একসময় স্কুল ডিঙ্গিয়ে যায়। কিন্তু স্কুলজীবনের এইসব স্মৃতি তার জীবনের সেরা সম্পদ হয়ে থাকে। একজন শিশুকে স্কুলে পাঠিয়েই সব দায়িত্ব শেষ করেন একজন অভিভাবক। কিন্তু যে স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হয়েছে, সে আদৌ স্কুলে গেল কিনা, তা জানা সম্ভব হয় না একজন শিক্ষকের। দিনের পর দিন স্কুল ফাঁকি দিলেও এটা জানা যায় না।

ভাল স্কুলগুলোতে 'পেরেন্টস ডে' অনুষ্ঠান করা হয়। যেখানে শিক্ষার্থীর ভাল-মন্দ নিয়ে, প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক-অভিভাবকদের সাথে আলাপ করেন, পারস্পরিক মত বিনিময় করেন। কারণ একজন মা কেবল তার সন্তানের কিছু বিষয় সম্বন্ধে অবগত থাকেন। কিন্তু একজন শিক্ষক সেই শিক্ষার্থীর প্রতিটি আচার-আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। তাই অভিভাবকের উচিত, সপ্তাহে নতুবা মাসে একবার বা বছরে একবার হলেও স্কুলে গিয়ে তার সন্তানের শ্রেণী শিক্ষকের সাথে আলাপ করে আসা।

সেদিন একজন শিক্ষার্থী তার রেজাল্ট কার্ড জমা দিয়ে গেল। তার কার্ডখানা দেখেই বুঝলাম ওভাররাইটিং-এ নম্বর বাড়ানো হয়েছে। শিক্ষার্থীকে ডেকে জিজ্ঞেস করাতে সে কেঁদে ফেললো এবং বললো, 'ও খালার কাছে থাকে। যদি কার্ডে কম নম্বর থাকে তাহলে তার খালা তাকে মেরে ফেলবে'। এই যদি হয় একজন অভিভাবকের আচরণ তাহলে একজন শিক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বন ছাড়া আর কি করবে? সেই অভিভাবক যদি উক্ত শিক্ষার্থীর প্রতি আন্তরিক থাকতেন, কেন সে কম নম্বর পাচ্ছে, তার সমস্যাটা কোথায়- এইসব বিষয়ে শ্রেণী শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করতেন; তাহলে একজন শিক্ষার্থী কিছুতেই এ ধরনের অসৎ পথ অবলম্বন করতো না।

এমনও অনেক শিক্ষার্থী আছে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষকগণ যাদের দেখে আসছেন, কিন্তু তাদের মা-বাবার সাথে পরিচয় হয় না। উক্ত শিক্ষার্থীরা তার স্কুলে প্রশংসিত হচ্ছে, না নিন্দিত হচ্ছে তা শিক্ষার্থীর অভিভাবকের জানারও প্রয়োজন হয় না। অনেক সীমিত সুযোগের ভেতর দিয়েই যারা শিক্ষকতা করেন, তাঁরা একজন শিক্ষার্থীকে তার জীবনের পথে পরিচালিত হবার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। জানি না তাঁদের এই কাজ পরবর্তী জীবনে ওদের কতটুকু প্রয়োজন হয়। ওদের দেয়া যায় না উপযুক্ত পরিবেশ। ন্যূনতম চাহিদা পূরণেও শিক্ষকগণ অনেকসময় ব্যর্থ হন। অনেকসময় স্কুলের কলে পানি আসে না। শিক্ষার্থীরা পানির পিপাসায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। না দেয়া যায় ভাল স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন এই ব্যবস্থাটির। অথচ অনেক ভাল স্কুলেও এই ব্যবস্থাটি তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। এটা যেন প্রয়োজনের বাইরের একটি ব্যবস্থা। হলেও চলে, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই। স্কুল কর্তৃপক্ষ, কমিটির সদস্য বা চেয়ারপারসন প্রত্যেকেরই এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

এ সবকিছুর সাথে অভিভাবকবৃন্দকেও আরো একটি বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। স্কুলে পাঠানোর সময় সন্তানকে কিছু নাশতা করিয়ে, পানির বোতল ব্যাগে পুরে স্কুলে পাঠানো প্রয়োজন। অনেকের সামর্থ্য হয় না টিফিন দিয়ে দেয়া। তবুও যদি অভিভাবকরা একটু সচেতন হন, তাহলে কিছু না কিছু ঘরেই তৈরী করে দেয়া যেতে পারে।

একজন ছাত্রী বা ছাত্র এমনিতেই ভাল হয়ে যায় না। তার জন্য প্রয়োজন অনেক আনুষঙ্গিক জিনিসের ব্যবস্থার। আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীর সমস্যা বুঝতে হবে তার অভিভাবককে। বুঝতে হবে তার শিক্ষককে। তাহলেই আগামীদিনে পাওয়া যাবে একজন সুস্থ, সুন্দর মেধাবী আর পরিচ্ছন্ন মানুষ। ❑